পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক হিন্দুরা এই প্রথার ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু বাইরে খোলাখুলিভাবে এই বিষয়টা আলোচনা করতে তারা দ্বিধা করে পাছে হিন্দু সভ্যতা এই অন্যায় প্রথা অনুসরণের দায়ে অভিযুক্ত হয় এই ভয়ে। এই ব্যবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় ১৯৩৬ সালের পুনা প্যাক্ট (Poona Pact) ও ১৯৩৭ সালে নির্বাচন উপস্থিত হয়। আম্বেদকর অত্যন্ত কড়া ভাষায় বর্ণহিন্দুদের সমালোচনা করেন এবং সেই সমালোচনা তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ 'Annihilation of Caste'-এ প্রতিফলিত হয়।

তিনি বলেন যে 'অস্পৃশ্যতা' হল বর্ণহিন্দু ব্যবস্থার সবচেয়ে করুণ সামাজিক দিক। হিন্দু সংস্কারবাদীরা অস্পৃশ্যতা প্রথার অবসান চান ঠিকই কিন্তু তারা কখনোই তাদের রক্ষণশীল সতীর্থদের পরিত্যাগ করতে চান না। কিন্তু এই অচ্ছুত শ্রেণী পূর্ণ সংস্কারের দাবী জানায়। কাজেই আম্বেদকর মনে করেন যে হিন্দুবাদের মধ্যে সংস্কার সম্ভব নয় এবং বর্ণহিন্দুদের দ্বারা সংগঠিত সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা কার্যত অচ্ছুত শ্রেণীর কোনই লাভ হবে না। ১৯৪৩ সালে আম্বেদকরের একটি লেখায় তাঁর এই ধারণা আরও একবার প্রতিফলিত হয়। তিনি লেখেন যে অচ্ছুত শ্রেণী যদি আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিত্বের জন্য বর্ণহিন্দুদের উপর নির্ভর করে তবে সংখ্যায় তারা যতই বড় হোক না কেন তাদের কোন লাভ হবে না। কারণ, বর্ণহিন্দুদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবেই তথাকথিত অস্পৃশ্যশ্রেণীর স্বার্থ থেকে ভিন্ন।

কাজেই বর্ণহিন্দু এবং তথাকথিত অস্পৃশ্যদের মধ্যে যে সীমারেখা সেটা সম্পূর্ণভাবে সমাজে কার্যকরী হয়। যদিও সেই ভেদরেখা অবসানের জন্য গান্ধী এবং নেহরু অনেক চেষ্টা করেন। এবং নেহরু জাতব্যবস্থা অবসানের জন্য রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতার দাবী তোলেন।

গান্ধীর অনুমোদনে এবং আম্বেদকরের যুক্তি অনুযায়ী পুনা প্যাক্ট অনুসারে সংরক্ষণের নীতি অনুসরণ করা হয়। যদিও ঐতিহাসিক ১৯৩২ সালের চুক্তি নিয়ে পরবর্তীকালে গান্ধীর সঙ্গে আম্বেদকরের পর্যায়ক্রমে বাদানুবাদপূর্ণ আলোচনা চলে। সামাজিক বর্ণব্যবস্থা এবং তারই স্বাভাবিক পরিণতি অর্থাৎ অস্পৃশ্যতা রীতি নিয়েই তাদের মূল বাদানুবাদ হয়। গান্ধী অস্পৃশ্যতাকে কখনই বর্ণাশ্রম ধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি বলে স্বীকার করেননি। এবং তিনি মনে করতেন অস্পৃশ্যতাকে বাদ দিয়ে প্রকৃত জাতব্যবস্থা সমাজে শুধু কাম্যই নয় প্রয়োজনীয়ও বটে। গান্ধী বলেন যে, অস্পৃশ্যতা কখনই জাতব্যবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়নি বরং হিন্দুবাদের মধ্যে উঁচু-নীচু এই প্রভেদীকরণ যে অলক্ষে প্রবেশ করেছে তারই পরিণতি হল এই তথাকথিত 'অস্পৃশ্যতা'। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আক্রমণ হল আসলে সামাজিক উঁচু ও নীচু অবস্থানের বিরুদ্ধে আক্রমণ। গান্ধী মনে করতেন যে অস্পৃশ্যতা নামক এই সামাজিক কুপ্রথার অবসান হলে তবেই জাতব্যবস্থা শুদ্ধ হবে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে এই শুদ্ধ জাতব্যবস্থাই সমাজে প্রকৃত বর্ণাশ্রমের জন্ম দেবে। যে বর্ণাশ্রমের ফলে সমাজে এমন এক বিভাজন রেখা হবে যেখানে প্রত্যেক কর্মই প্রত্যেকের কাছে সমানভাবে প্রয়োজনীয় এবং কেউই কারও থেকে ছোট বা বড় বলে চিহ্নিত হবে না। আম্বেদকর তার প্রকাশিত 'Annihilation of Caste (1936)'-এ যেভাবে জাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তাতে গান্ধী খুবই হতাশ হয়েছিলেন এবং 'হরিজন' পত্রিকায় (জুলাই ১১, ১৯৩৬) তিনি লেখেন যে ড. আম্বেদকর হলেন হিন্দুত্বের উপর এক আক্রমণ। হিন্দু শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ হয়ে তিনি নিজের স্বকর্ণ হিন্দুদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছেন তাতে তিনি এতটাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন যে তিনি শুধু তাদেরই পরিত্যাগ করার প্রস্তাব দেন তাইই নয়, তিনি তাঁর নিজের ধর্ম এবং সংস্কৃতিকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। ("Dr. Ambedkar is a challenge to Hinduism. Brought up as a Hindu, educated by a Hindu potentate, he has become so disgusted with the so-called Savarna Hindus for the treatment that he and his people have received at their hands that he proposes to leave not only them but the very religion that is his and their common

গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রেণী রাজনীতিতে জাতের ভাষা ব্যবহার করবার প্রচুর উদাহরণ আছে। সেই সঙ্গে দলিত ও উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরাও নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় রক্ষার জন্য দীর্ঘ দাবী জানিয়ে আসছিল। সমাজবিদ এবং সমাজ নৃতাত্ত্বিকদের মতে বিচ্ছিন্নতা, অনুন্নতা এবং সাংস্কৃতিক বিশেষত্বই হল দলিত এবং আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য। উপজাতি হল বিশেষ কোন গোষ্ঠীভুক্ত সম্প্রদায় (ethnic groups)। সমাজে সাধারণ গোষ্ঠী বা কৃষক সম্প্রদায় থেকে উপজাতির লোকেদের জীবনধারা ভিন্ন। প্রত্যেক উপজাতির লোকেদের স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব সংস্কৃতি, উপভাষা, জীবনধারা, সামাজিক কাঠামো, রীতি এবং মূল্যবোধ আছে। আবার কর্মক্ষেত্রে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত কৃষিজীবী এবং নিজেদের মধ্যেই সামাজিক বৈষম্য গড়ে তুলেছে। কৃষিক্ষেত্রে তাদের সমস্যা অন্য সাধারণ কৃষকদের মতোই। ভারতে প্রায় ৪১৪ টি উপজাতি সম্প্রদায় আছে এবং তাদের মধ্যে ২১২ টি সম্প্রদায়কে 'সিডিউলড্ ট্রাইব্স' (Scheduled Tribes) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদেরকে কখনও আদিম কিসান অথবা বনবাসী বলে বর্ণনা করা হয়। কে. সুরেশসিং এইসব আদিবাসীদের সামাজিক গঠনের বৈচিত্র্য, দৃঢ় সম্প্রদায়িক সচেতনতা এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বৈষম্যহীনতার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে উপজাতীয় আন্দোলনগুলি মূলত কৃষি, এবং বন ভিত্তিক কারণ বনের উপর তাদের নির্ভরশীলতা জমির উপর নির্ভরশীলতার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া গোষ্ঠীগত উপাদানও আছে। উপজাতি বিদ্রোহ জমিদার, মহাজন এমনকি সাধারণ সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধেও গড়ে উঠেছিল। কারণ এই নয় যে এদের দ্বারা তারা শোষিত হত কিন্তু বিদ্রোহের কারণ হল এরা সকলেই উপজাতিদের চোখে বাইরের লোক বা সেই অর্থে বিদেশি।

কাজেই উপজাতি এবং অচ্ছুতরা শ্রেণী ও জাত উভয় আন্দোলনেরই অংশ। ঘনশ্যাম সা (Ghanshyam Shah) দলিত আন্দোলন উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে দেশের বিভিন্ন অংশে দলিতরা কখনও হরিজন, কখনও অবর্ণ, কখনও পঞ্চমা, অতিশূদ্র, অন্তজা বা কখনও নমশূদ্র নামে পরিচিত এবং হিন্দু জাতব্যবস্থায় এদের অবস্থান একদম নীচের সারিতে। ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ১৬ শতাংশ হল এই উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থাৎ ২০০১ সালের হিসেব অনুযায়ী এদের সংখ্যা প্রায় ১,৬৮০ লক্ষ। এই জনসংখ্যার প্রায় ৩৬ শতাংশ কাজ করে এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৪৮ শতাংশই হল কৃষিজীবী শ্রমিক। এদের মধ্যে অনেকেই ঝাড়ুদার বা ছাল ছাড়ানোর কাজ করে সিডিউলড্ কাস্টের (SCs) লোকেরা কোন বিশেষ অঞ্চলের পরিবর্তে সমস্ত দেশ জুড়েই ছড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে সা (Shah) খুব সঙ্গতভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, আইনত তারা আর অচ্ছুত নয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এদের মধ্যে অনেককেই এখনও সেই অপবাদ বহন করতে হয়। কিন্তু তাদের এই ক্ষোভ, বিক্ষোভ দীর্ঘ ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বা কখনও সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করবার আগে জাতব্যবস্থা এবং অস্পৃশ্যতা বিষয়ে আম্বেদকর এবং গান্ধীর মতাদর্শ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

আম্বেদকর ১৯১৬ সালের জাতব্যবস্থার উৎপত্তি বিষয়ে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পুরোহিত শ্রেণী হিন্দু সমাজের স্তরবিন্যাসের পর্যায়ে সামাজিকভাবে সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে। এই শ্রেণী অতি কঠোরভাবে অন্তর্বিবাহ, সতী প্রথা, বিধবা প্রথা এবং বাল্য বিবাহ এইসব সামাজিক প্রথা অনুসরণ করে নিজেদের একটি সঙ্কীর্ণ জাতে পরিণত করে। স্বাভাবিকভাবেই এইসব প্রথার বাইরে যেসব শ্রেণী অবস্থান করে তারা সমাজে অব্রাহ্মণ জাত হিসেবে পরিচিত হয়। এইসব সামাজিক প্রথা অনুসরণের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত শ্রেণীই জাতে পরিণত হয়। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার এই জাত প্রথার কঠোর সমালোচক ছিলেন আম্বেদকর। যেমন, তিনি বলেছেন শূদ্র ছাড়া হিন্দু সভ্যতা তিনটি সামাজিক শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। সেগুলি হল—অপরাধী উপজাতি, আদিম অধিবাসী এবং অচ্ছুত অধিবাসী। এই সমস্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব তাঁর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের ছিল। এবং রক্ষণশীল হিন্দু সংস্কৃতি অস্পৃশ্যতা অনুসরণে কোনরকম অন্যায় দেখত না। তাদের কাছে এই প্রথা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক রীতি। কাজেই এই প্রথা অনুসরণের জন্য কোন ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন বা প্রায়শ্চিত্ত করবার কোন তাগিদ তারা অনুভব করেনি। কিন্তু সময়ের

Scanned with CamScanner

কমিশনের ফলে রাষ্ট্রের আরও একটা সুবিধা হয়—সেটা হল কমিশনের সুপারিশ নিয়ে দেশব্যাপী এমনকি সচেতন শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও অকারণ বিতর্ক চলতে থাকে। যেমন কেউ কেউ সম্প্রদায় বনাম ব্যক্তির ভিত্তিতে সুপারিশকে বিশ্লেষণ করে এর পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত দিতে থাকে। আবার অনেকে বৃদ্ধি বনাম সংরক্ষণের পক্ষে বিপক্ষে প্রশ্ন তোলেন। কাজেই মূল বিষয়কে ছাড়িয়েও অনেক সময় প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক বিতর্ক চলতেই থাকে। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আমলাতান্ত্রিক দক্ষতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক অহমিকা রক্ষার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ওঠে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবিরাও অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই বিতর্কের জালে জড়িয়ে পড়েন। অবশ্য তারা বিকল্প একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সমাজসংস্কারের পরিবর্তে তারা শ্রেণীর নিরিখে বিষয়টি পর্যালোচনা করবার দাবী জানায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সংরক্ষণবাদই প্রাধান্য পায়।

এই আলোচনা থেকে এটা বলা যায় যে সংবিধানে বা বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির রিপোর্টে যে সংরক্ষণের কথা বলা আছে তা নিয়ে তর্কবিতর্ক করা একেবারেই অর্থহীন কারণ বিষয়টি রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র যখন ইচ্ছে করে তখনই বিষয়টি নিয়ে তুমুল সোরগোল চালায় আবার সুবিধেমতো তাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখে। ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে জমির মালিকানার পুনর্গঠন, সকলের জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার নিশ্চয়তা এবং কাজের অধিকারের সুনিশ্চয়তা—এই তিনটি নীতিই হল আসলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমস্যার আংশিক সমাধান। এই তিনটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র আশ্চর্যজনকভাবে নিষ্ক্রিয়। স্বাধীনতার পর থেকেই রাষ্ট্র মূল সমস্যার সমাধান না করে বিভিন্ন রকম বিভ্রান্তমূলক নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সার্থকভাবে শ্রেণী ঐক্য রোধ করে নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করতে সচেষ্ট হয়েছে। সবসময়ই লক্ষ্য করা যায় রাষ্ট্র সঠিক নীতিকে প্রতিহত করে বেঠিক নীতিকে মদত জুগিয়েছে। এর ফলেই জাতবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদিতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাষ্ট্রীয় মদতে সক্রিয় হয়েছে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে সংরক্ষণের নীতি নেহাতই রাজনৈতিক চমক। এই নীতি কখনোই মূল সমস্যা সমাধান করতে পারে না। আধিপত্যকারী শ্রেণী যারা রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি তারাই আসলে এই সংরক্ষণের সুবিধা কাজে লাগায়। অস্পৃশ্যতা ও পশ্চাৎপদ শ্রেণীর সমস্যা সমাধানে ঔপনিবেশিক শাসক ও পরবর্তী জাতীয় শাসকও শেষ পর্যন্ত সুবিধাভোগী শ্রেণী ও উচ্চ বর্ণহিন্দুর সাংস্কৃতিক স্বার্থে অসম ক্ষমতাবণ্টনের পক্ষেই সমঝোতা করেছে। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সংরক্ষণ প্রকল্প আছে তা কখনোই আর্থ-সামাজিক আধিপত্য ও আনুগত্যের সংস্কৃতি পরিবর্তনে সচেষ্ট নয়। কাজেই মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের আংশিক বা পূর্ণ বাস্তবায়ন সমাজের সর্বস্তরে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর সমান প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করবে—এমনটা আশা করা খুবই দুরাশা বা অলৌকিক নয় কি?

Scanned with CamScanner

কমিশনের প্রস্তাবিত সংরক্ষণ নীতির প্রতি আশঙ্কা প্রকাশ করে একজন সদস্য সংরক্ষিত তালিকার কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। তিনি বলেন পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর মধ্যে যারা অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে এগিয়ে আছে তাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র তালিকা প্রকাশ করার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবের ফলে বঞ্চিত পশ্চাৎপদ শ্রেণী (depressed backward classes) বলে একটি নতুন শ্রেণীকে চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের জন্য সংরক্ষণের বিশেষ সুবিধা নির্দিষ্ট করা হয়। এছাড়া উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে বর্তমান একটি বিশেষ সমস্যার প্রতিও দৃষ্টিপাত করা হয়। সেখানে সামাজিক শ্রেণীগত স্তরবিন্যাসের জন্য এগিয়ে যাওয়া শ্রেণীই পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর বা OBC (Other Backward Classes) তপশিলী জাতিকে নির্যাতিত বা তপশিলী সম্প্রদায়ের কৃষক শ্রমিকদের উপর ত্রাস সঞ্চার করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিচ্ছে এবং সেইসব কৃষিজীবী শ্রমিকরা এখন সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবী জানাচ্ছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ (মোট জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ) জনগণকে সংরক্ষণের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হল মণ্ডল কমিশনের একটা বড় অসংলগ্নতা। শুধুমাত্র জাতের কারণেই অধিকাংশ জনগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত প্রগতি থেকে বঞ্চিত হয় এটা নথিভুক্ত করাও রাষ্ট্রের পক্ষে দুঃখজনক। এর অর্থ দাঁড়ায় স্বাধীনোত্তর ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সংখ্যালঘিষ্ঠের অত্যাচার কায়েম করেছে। যদি এই যুক্তি মেনে নেওয়া হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে এই আইনানুগ রাজনৈতিক কাঠামো যা মূলত সংখ্যালঘু শ্রেণীকে তোষণ করে সেটা কি আদৌ সংখ্যাগুরুর অগ্রগতির জন্য কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করবে? সেই সময়ে কিছু সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যারা দীর্ঘ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার শিকার তাদের জন্য সংরক্ষণ বা বৈষম্যপূর্ণ সুবিধার নীতি অবশ্যই অর্থপূর্ণ। কিন্তু যেখানে অধিকাংশ জনগণই বঞ্চনার শিকার সেখানে তো সংরক্ষণের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় কাঠামোরই মৌলিক পরিবর্তন অধিক কাম্য। কিন্তু প্রশ্ন হল যেখানে অধিকাংশ মানুষই রাষ্ট্রীয় বঞ্চনার শিকার সেখানে কীভাবে রাষ্ট্রের দোষ ইত্যাদি প্রকাশ করবার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিশন রাষ্ট্র গঠন করে?

বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য আমাদের ভারতীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করতে হবে। স্বাধীনতার অর্ধ-শতাব্দীর বেশি সময় অতিবাহিত হবার পরেও এমনকি অনগ্রসর শ্রেণীর অবস্থা পর্যালোচনা করবার জন্য দুটো কমিশন গঠিত হবার পরেও কিন্তু দুর্বল এবং অনুন্নত শ্রেণীর জীবনধারণের মানের কোনই গুণগত পরিবর্তন হয়নি। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায় নিম্নবর্গীয় মানুষের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার, খুন এমনকি লুঠপাট ক্রমেই বেড়ে চলছে। এইরকম নিষ্ঠুরতার হিসেব নিলে দেখা যায় যে ১৯৭৭ সালে যেখানে ১০ হাজার ৮৭৯টি এরকম ঘটনা ঘটেছিল সেখানে ১৯৮০ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১৩ হাজার ৮৬৬টি ঘটনা। আবার ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল এই সময়ের মধ্যে তা আরও বেড়ে ১৫ হাজার ১৭টি হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে ক্ষমতায় যে দলই থাকুক না কেন নিম্নবর্গীয় মানুষের উপর নৃশংসতার ঘটনা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। একইভাবে অস্পৃশ্যতাজনিত অপরাধের সংখ্যাও ঊর্ধ্বগামী। তথ্য অনুযায়ী ১৯৫৫ ও ১৯৭০ সালে ৬,৭৭৮টি এই জাতীয় অপরাধের কথা পুলিশের দৃষ্টিগোচরে আনা হয়। কিন্তু মাত্র ১,৭৭৯টি ক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭৬ সালে সম্পূর্ণভাবে অস্পৃশ্যতা নির্মূল করবার জন্য প্রণীত Civil Rights Act-ও এই অপরাধপূর্ণ দমনে ব্যর্থ। তপশিলী জাতি ও উপজাতিও একই ভাবে বঞ্চনার শিকার। সত্তরের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে সারা ভারত হরিজন সেবক সঙ্ঘ ১,১৫৫টি গ্রামে অভিযান চালায় এবং দেখা যায় প্রায় ষাট শতাংশের অধিক গ্রামে সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট কুয়ো বা জলাশয় থেকে তপশিলী সম্প্রদায়কে জল আনতে অনুমতি দেয় না এমনকি গ্রামে ও শহরে অবস্থিত মন্দিরগুলোতেও তাদের প্রবেশাধিকার নেই। একইভাবে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরাও বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে জমি থেকে বঞ্চিত করাও একটা স্থায়ী সমস্যা। ছোটনাগপুর অঞ্চলে যেখানে জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে মাত্র পাঁচ শতাংশ এই সম্প্রদায়ের মানুষ শিল্পশ্রমিক

Scanned with CamScanner

১০ □ জাতি, শ্রেণী এবং রাজনীতি

ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির অনন্য বৈশিষ্ট্য হল জাতপাত ব্যবস্থা। ভারতের জাতপাত ব্যবস্থা সামাজিক স্তরবিন্যাসের অনন্য উদাহরণ। মূলত হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে গঠিত এই জাতব্যবস্থা সমাজে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করে। ভারতের মুসলমান, খ্রীস্টান, শিখ, জৈন প্রভৃতি অ-হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাতপাত সুলভ ভেদাভেদ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের জাতপ্রথাকে অনন্য ও অদ্বিতীয় বলে চিহ্নিত করা হয়। জাতপ্রথাকে হিন্দুসমাজের ইস্পাত কাঠামো বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ কোন বৈদেশিক আক্রমণ বা ধর্ম আন্দোলন এই কাঠামোয় ভাঙন ধরাতে পারেনি। বরং অন্যান্য ধর্মও জাতপ্রথার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে এই ব্যবস্থা কার্যত ভারতীয় ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে। সনাতন ধারণা অনুযায়ী জাত ও বর্ণ অভিন্ন। এই প্রথা অনুসারে ভারতীয় সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত। এই চারটি বর্ণ হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সমাজে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল ব্রাহ্মণ। তার নীচে পর্যায়ক্রমে অবস্থান করত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই বিভাজন ছিল মোটামুটি সার্বিক ও অলঙ্ঘনীয়। বর্ণাশ্রমের ধারণা অনুযায়ী সমাজে মাত্র চারটি স্বীকৃত বর্ণের অস্তিত্ব ছিল। আধুনিক রাজনৈতিক সমাজবিদরা অবশ্য জাতের অস্তিত্ব বাস্তব প্রেক্ষাপটে বিচার করতে বেশি আগ্রহী। তারা বৃত্তি এবং সমাজের বিস্তৃত প্রথা, রীতিনীতি, সংস্কৃতি এবং আচরণের প্রেক্ষাপটে জাতের পর্যলোচনা করতে সচেষ্ট। বর্ণাশ্রমের ধারণা অনুযায়ী সমাজে মাত্র চারটি স্বীকৃত বর্ণের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আধুনিক ধারণা অনুযায়ী জাতের অস্তিত্ব আঞ্চলিক ভাবে নির্দিষ্ট এবং তার কাঠামোগত গঠন বস্তুগত পরিবর্তনের ধারা অনুযায়ী অনেক বেশি নমনীয়। যেমন ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের এক-একটি খণ্ডে কয়েকশত জাতের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। দীপঙ্কর গুপ্তের মতে সামাজিক সংগঠন হিসেবে জাতের অবস্থান ভিন্ন। এটা সবসময়ই স্তরবিন্যাসের নীতি মেনে চলে না।

লুইস ডুমন্টের মতে 'পবিত্র' এবং 'অপবিত্র'র ধারণা এটাই হল জাতব্যবস্থার আদর্শগত ভিত্তি। এই আদর্শের ভিত্তিতেই সমাজে উঁচু এবং নীচু জাতের বিন্যাস হয়। প্রত্যেক জাতের নির্দিষ্ট রীতি ও আচরণের ভিত্তিতেই সমাজে তাদের পরিচয় নির্দিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণরা সবসময়ই তাদের আচারআচরণের মধ্য দিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভুত্ব করতে চায়। এই প্রাধান্য প্রতিরোধের জন্য সমাজে অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে এবং তারা রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের সমালোচনা করেন। যেমন প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধধর্ম, নানক ও কবিরের ভক্তি আন্দোলন এবং মধ্যযুগের শেষে চৈতন্যদেব সমাজে এই আধিপত্য এবং আনুগত্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক উদারনীতিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারায় শিক্ষিত আধুনিকতাবাদ জাতকে ক্রমশই রাজনীতির আঙিনায় টেনে আনে এবং জাতব্যবস্থা সমাজে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের জন্য সোচ্চার হয়। অব্রাহ্মণ জাতের নেতৃত্ব ক্রমেই তাদের শ্রেণীভুক্ত লোকেদের জন্য শিক্ষার বিস্তার আচার-আচরণের পরিবর্তন এবং নিজেদের ভেতর আমূল সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হয়। সবার উপরে অব্রাহ্মণ জাতের লোকেদের মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ গড়ে তোলাই ছিল নেতৃস্থানীয় লোকেদের লক্ষ্য। যেমন জয়তিরাও ফুলে ১৮৭৩ সালে মহারাষ্ট্রে সত্যসোধাক সমাজ (Satyasodhak Samaj) গঠন করেন। এবং রামস্বামী (Ramswami Naicker) তামিলনাড়ুতে ১৯২০ সালে অব্রাহ্মণ জাতের আত্মমর্যাদা বোধ উন্নীত করবার জন্য এবং ব্রাহ্মণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেন। কৃষক, অচ্ছুত, দলিত, আদিবাসী এবং প্রান্তদেশীয় সামাজিক গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত বহুজন সমাজকে ঔপনিবেশিক শাসক এবং উচ্চ জাতের স্থানীয় হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করবার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে গরিব কৃষকদের আন্দোলন, সমাজে নিপীড়িত ও পদদলিত জাতের আন্দোলন এবং জাতীয় আন্দোলন ক্রমেই একটা সার্বিক অথচ জটিল এবং পরস্পর বিরোধী চরিত্রের রূপ নেয়। জাত এবং শ্রেণী পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হলেও নিজেদের স্বতন্ত্র কাঠামোগত পরিচয় বিসর্জন দেয়নি। বিংশ শতাব্দী ধরে ভারতের

Scanned with CamScanner

প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃতি। আম্বেদকরের জীবনের শেষ দশ বছর তাঁকে দ্বৈত ভূমিকায় দেখা যায়। একদিকে সাংবিধানিক প্রণেতা হিসেবে তিনি পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা এবং সংরক্ষণের জন্য সওয়াল করেন অন্যদিকে সমাজবিদ হিসেবে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদার অবক্ষয়ের জন্য তিনি প্রচলিত সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করেন।

১৯৩২ সালের পুনা প্যাক্ট বা ১৯৩৫ সালের ভারতীয় সংবিধান অ্যাক্ট কিংবা ১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধানের ওপর যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, ভারতে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর যথার্থ মূল্যায়ন কোথাও হয়নি। তিনটি ক্ষেত্রেই মূলত একই রকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাদের বিচার করা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন সত্ত্বেও পিছিয়ে-পড়া জাতীর কোন গুণগত মান উন্নয়নের কথা বলা হয়নি। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমনকি পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর জন্য গঠিত দুটি কমিশনের রিপোর্টেও বিষয়টি সম্বন্ধে ধারণাগত অস্পষ্টতা প্রতীয়মান।

প্রথমে সংরক্ষণের নীতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আসলে এই সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল অনেক আগেই—১৮৮০ সালে মাদ্রাজে। ঔপনিবেশিক শাসনকালেই শাসনবর্গ বিভাজন এবং শাসন এই নীতির স্বার্থেই সমাজের তথাকথিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী এলিটদের তুষ্ট করবার জন্য ইচ্ছেমতো শ্রেণীবিভাজন করেছে। এবং মূল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে সমাজের পিছিয়ে-পড়া ও বঞ্চিত শ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বর্ণহিন্দু এবং তথাকথিত বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক শাসক তাদেরই নির্মিত অবহেলিত শ্রেণীর পরিত্রাতা হিসেবে সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন জানায়।

গান্ধীজী যে অস্পৃশ্যতা নিয়ে এত সরব ছিলেন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সালে স্বাক্ষরিত পুনা প্যাক্টে তারও কোন উল্লেখ ছিল না। বস্তুতপক্ষে পুনা প্যাক্ট এবং ১৯৩৫ সালের ভারত অ্যাক্টই স্বাধীনোত্তর সংবিধানের সংরক্ষণ নীতি নির্ধারিত করেছিল। বি. আর. আম্বেদকরকে চেয়ারম্যান করে স্বাধীন ভারতে সংবিধানের খসড়া কমিটি ১৯৩৫ সালের ভারত অ্যাক্টেরই পুনরাবৃত্তি করে। মূলত ঔপনিবেশিক শাসকদের মতোই একই রাজনৈতিক উদ্দ্যেশে স্বাধীন ভারতেও সংবিধান-প্রণেতারাও পিছিয়ে-পড়া শ্রেণী বা backward class-র যথার্থ সংজ্ঞায়ন করেননি। 'পিছিয়ে-পড়া' বলতে সঠিকভাবে কাদের বোঝানো হবে—এই বিষয়ে স্বাধীন ভারতের সংবিধানও কোন স্পষ্ট নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এরকম বললে অত্যুক্তি হয় না যে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা হিন্দুদের দিয়েছে ভারত, মুসলিমদের পাকিস্তান এবং তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের দিয়েছে সংরক্ষণ। কংগ্রেস 'নেতৃবৃন্দ ভারত বিভাজন এবং স্বাধীনতার পরে সংরক্ষণ নীতি সামাজিক বৈষম্য এবং অবিচার দূর করবার জন্য গ্রহণ করেননি বরং তারা এই নীতিকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। পিছিয়ে-পড়া জাতি এবং উপজাতির মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তথাকথিত এলিটদের তুষ্ট করাই ছিল এই সংরক্ষণের আসল উদ্দেশ্য। সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতা অবসানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই অস্পৃশ্যতা লঙ্ঘনে সঠিক কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে যে বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশের জন্য ভারতবাসীকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এবং সেই নির্দেশিকা বা আইনও এতই অকার্যকর ছিল যে প্রায়শই সেটা লঙ্ঘিত হত। এবং সংবিধান সংশোধন করে ১৯৭৬ সালে নতুন আইন (Protection of Civil Rights (Amendment) Act, 1976) পাস করা হয়। এবং এই নতুন আইনও আগের তুলনায় বিশেষ কার্যকরী নয়।

এইরকম সামাজিক প্রেক্ষাপটে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর জন্য ১৯৫৩ ও ১৯৭৮ সালে গঠিত দুটো কমিশনের চিন্তাধারা পর্যালোচনা করতে হবে। জাতি প্রথাকে যেহেতু ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয় সেই কারণে আম্বেদকরের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়া সত্ত্বেও 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতবর্ষ এই প্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেনি। এই কারণে কমিশন মূলত ভারতীয় সমাজে শ্রেণীবৈষম্য ও জাতিবিরোধের আর্থ-সামাজিক কারণগুলো খুঁজে দেখবার চেষ্টা করে।

Scanned with CamScanner

ফেলছে কিন্তু কর্মক্ষেত্রেও তাদের ... displace them, dams drown them, afforestation starves them' অর্থাৎ শিল্পায়ন তাদের স্থানচ্যুত করেছে, উপত্যকা তাদের নিমজ্জিত করেছে এবং বনাঞ্চলের ধ্বংসতা তাদের ক্ষুধার্ত করেছে।

অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের এই যদি সরকারি প্রচেষ্টার চেহারা হয় যদিও এই ব্যাপারে অনেক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তাহলে যতই সংরক্ষণ বা অগ্রাধিকার দেবার পরিকল্পনা করা হোক না কেন শক্তিশালীদের দ্বারা পিছিয়ে-পড়া শ্রেণী তাদের কতটা উপকার হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। বরং বলা যায় প্রকৃত সামাজিক অবস্থার মূল্যায়ন না করে যে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা হয় সেটা নেহাতই রাজনৈতিক চাল ছাড়া আর কিছুই নয়। জাতের আড়ালে দলিতদের আর্থ-সামাজিক সংগ্রামকে বিচার করে কার্যত ধর্মনিরপেক্ষতা এবং শ্রেণীসংগ্রামের উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করে দেবার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলে সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তনের বদলে গতানুগতিক আমলেরই স্থিতিস্থাপক করা হচ্ছে। কোটি কোটি ভারতবাসী সামগ্রিকভাবে নিজেদের সামাজিক শোষণ ও বঞ্চনার কথা না বিচার করে জন্মসূত্রে পাওয়া ক্ষুদ্র জাতের মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

ভারতে বহুত্ববাদী সংস্কৃতির মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জাতের রাজনীতিকরণ বাড়ছে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ বলা হয় এই জাত বা উপজাত রাষ্ট্রের সৃষ্টি নয়, এটা সমাজপ্রসূত একটা ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র এই শ্রেণিবিন্যাসের ঊর্ধ্বে উঠে এই ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের চেষ্টা করছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে একটা নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি জনগণের মাঝে তুলে ধরবার চেষ্টা করে কারণ সামাজিক আচরণ বা মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা কিছুই রাষ্ট্রের আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় না।

ভারতে যে ধরনের শ্রেণীশাসন আছে সেখানে জাতকে কেন্দ্র করে যতই সংঘর্ষ ও সমস্যা সৃষ্টি হবে ততই অরাজকতা বাড়বে। মণ্ডল কমিশনের গঠন ও সুপারিশকে কেন্দ্র করে সব রাজনৈতিক দলই রাজনীতি করতে শুরু করে। কমিশনের সুপারিশকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস, জাতীয় ফ্রন্ট ক্রমেই রাষ্ট্রকে একটা সংকটের মধ্যে নিয়ে যায় এবং জনগণ দলগুলোর প্রতি আস্থা হারায়। রিপোর্ট বিষয়ে কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তা এবং জাতীয় ফ্রন্টের সক্রিয়তা—এই দু-ধরনের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আসলে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের কংগ্রেস শাসক সযত্নে রিপোর্ট চেপে রেখেছিল কিন্তু কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে অত্যন্ত গোপনে রিপোর্টের কিছু সুপারিশ কার্যকরী করেছিল। যেমন, ১৯৮৫ সালের প্রথম দিকেই গুজরাটে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে পিছিয়ে-পড়া জাতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের সীমা দশ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আঠাশ শতাংশ করা হবে এবং এই সংরক্ষণ অবশ্যই তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য প্রচলিত একুশ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকরী রেখেই করা হবে। এই সিদ্ধান্তের প্রবল প্রতিক্রিয়া হয় এবং আশির দশকেই দুই শত পঁচিশ জন ব্যক্তি নিহত হয় ও আনুমানিক দু হাজার দুশো কোটি টাকার জাতীয় সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। কাজেই বলা যেতে পারে পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালে ৭ই অগাস্ট জাতীয় ফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় যে সামাজিক বিস্ফোরণ হয় সেটা মূলত পূর্ববর্তী নীতিরই ধারাবাহিকতা।

কংগ্রেস দলের মৌনতা বা জাতীয় ফ্রন্টের বাগাড়ম্বর কিংবা মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ রাজনীতির পক্ষে আকর্ষণীয় হলেও, বঞ্চিত বা নিপীড়িত মানুষের চোখে এগুলো আদৌ কোন সার্থক হিতকারী নয়। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক বাড়াবার জন্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে ...

Scanned with CamScanner

(18th July, 1936) বলেন যে, বর্ণ এবং আশ্রম নামক দুটি প্রতিষ্ঠানের জাতব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই করার নেই। বর্ণ প্রথা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে আমাদের পূর্বপুরুষের প্রথা অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেকেরই বৃত্তির সন্ধানে রোজগার করতে হবে। এই ব্যবস্থা শুধুই আমাদের অধিকারই নয়, কর্তব্য বিষয়েও শিক্ষা দেয়। কোন কাজই ছোট নয় এবং কেউই উঁচুতে অবস্থান করে না। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সকলেই ভালো ও নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে এবং প্রত্যেকের সমান মর্যাদার অধিকারী। ("Varna and Ashrama are institutions which have nothing to do with castes. The law of varna teaches us that we have each one of us to earn our bread by following the ancestral calling. It defines not our rights but our duties.... It also follows that there is no calling too low and none too high. All are good, lawful and absolutely equal in status." Ref. Harijan, 18th July, 1936). জাতব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করে বর্ণের সপক্ষে সওয়াল করবার এই প্রচেষ্টা আম্বেদকর ছাড়াও অনেক সমাজসংস্কারকই সমর্থন করেননি। তাঁরা বলেন যে, বর্ণব্যবস্থাকে আঘাত না করে অস্পৃশ্যতা অবসানের এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র রোগের বাহ্যিক লক্ষণেরই উপশম ঘটাবে। অথবা বলা যেতে পারে এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র জলের ওপরে একটা রেখা টানার তুল্য। এবং শাস্ত্রের সাহায্যে অস্পৃশ্যতা ও জাতব্যবস্থা অবসানের চেষ্টা শুধুমাত্র কাদা দিয়ে কাদা পরিষ্কার করবার সমতুল্য।

আম্বেদকর অবশ্যই আরও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় গান্ধীর ধারণার সমালোচনা করেন। তাঁর নিজের ভাষায় "....What the Mahatma seems to me to suggest in its broadest and simplest form is that Hindu society can be made tolerable and even happy without any fundamental change in its structure if all the high caste Hindus can be persuaded to follow a high standard of morality in their dealings with the low caste Hindus. I am totally opposed to this kind of ideology. I can respect those of the caste Hindus who try to realize a high social ideal in their life. Without such men India would be an uglier and a less happy place to live in than it is. But nonetheless anyone who relies on an attempt to turn the members of the caste Hindus into better men, by improving their personal character is in my judgement wasting his energy and hugging an illusion... As a matter of fact, a Hindu does treat all those who are not of his caste as though they were aliens, who could be discriminated against with impunity and against whom any fraud or trick may be practiced without shame. This is to say that there can be a better or a worse Hindu. But a good Hindu there cannot be." অন্যদিকে নেহরু তাঁর বাস্তববাদী মানসিকতা নিয়ে মনে করেন যে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতব্যবস্থা একটা বাধাস্বরূপ। তিনি জাতব্যবস্থাকে সনাতনী আভিজাত্যের চিহ্ন বলে মনে করেন এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যুক্ত হন। অবশ্য আম্বেদকরের মত অত তীব্র ভাষায় গান্ধীর বর্ণাশ্রমের বিরোধিতা নেহরু করেননি। বস্তুতপক্ষে ১৯৪০ সালের গোড়ায় লিখিত নেহরুর প্রধান গ্রন্থ 'Discovery of India' -তে তিনি আম্বেদকরের কোন উল্লেখই করেননি এবং মাত্র দুই পাতায় (পৃষ্ঠা ২৫২-৫৩) অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি সমাজে পিছিয়ে-পড়া গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য বলেন যে শুধুমাত্র সমান সুযোগ-সুবিধা দিলেই চলবে না। সমাজে যারা এগিয়ে আছে তাদের সংগে সম মাত্রায় আনবার জন্য পিছিয়ে-পড়া গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্ণজাতি এবং অস্পৃশ্যতা বিষয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক বিরোধিতা থেকে এটা প্রতীয়মান যে মূল বিতর্কে পুনা প্যাক্ট একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। বিষয়টা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মানানসই হলেও নৈতিক ভাবে বা যৌক্তিকতার দিক থেকে একেবারেই সমর্থনীয় নয়।

কাকা কালেলকার জাতিকে সামাজিকভাবে পিছিয়ে-পড়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। বরং তিনি বলেন যে যদি আমরা জাতব্যবস্থাকে ত্যাগ করতে পারি তাহলেই সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রকৃত দরিদ্র এবং বঞ্চিত মানুষকে সাহায্য করা সম্ভব হবে। তিনি বিভিন্ন জাতের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বিষয়েও সাবধান করে দেন। তিনি মনে করেন যে জাতীয় ঐক্যের জন্য প্রয়োজন হল একদিকে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং অন্যদিকে সমগ্র জাতির ঐক্য ছাড়া অন্য কোন বিষয়কেই উৎসাহ দেওয়া সঠিক নয় বলেই তিনি মনে করেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও পরবর্তীকালে প্রশ্ন হয় যে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি ছাড়াও কি সমাজে এমন কোন শ্রেণী আছে যাদের সামাজিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাৎপদ শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়? যদিও এখানে শ্রেণী বা সেকশনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু মূল গ্রন্থে এই শ্রেণী বা সেকশনকে জাতি অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই গুণগত দিকটি উপেক্ষা করে পরিমাণের উপরই বেশি নজর দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ২,৩৯৯টি জাতির তালিকা দেওয়া হয়েছে যারা সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণী এবং সতর্ক করে দেওয়া হয় যে ... সংরক্ষিত রাখা উচিত নয়। ...